কেমন হবেন বৃটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী

হারুনূর রশীদ: তখন তার বয়স মাত্র ২৫ বছর। স্নেহময় বাবা একটি সড়ক দূর্ঘটনায় মারা যান। তিনি ছিলেন একজন এঙ্গলিকান ভিকার। তার বিয়ের একবছরের মধ্যে বাবা মারা যান। আর মা, ধমনীর বহুবিদ কাঠিন্য রোগে আক্রান্ত। তার বিয়ের মাস খানেকের মধ্যেই মারা গেলেন। দুঃখে ভাসা ছাড়া আর কি করার আছে। তিনি এখন একেবারেই একা। মা-বাবার সোহাগ যত্নে লালিত একমাত্র কন্যা তেরেসা মে। হ্যাঁ তেরেসা মে’র কথাই বলছি।



অবশ্য এই একাকিত্ব তাকে তার স্বামীর খুব কাছাকাছি আসতে সহায়তা করল। স্বামী ফিলিপ তার দু’বছরের ছোট। তার সাথে প্রথম দেখা হয় অক্সফোর্ডে, রক্ষণশীল দলের এক ডিস্কো পার্টিতে। তারা দু’জনেরই প্রিয় খেলা ক্রিকেট আর বিশ্ববিদ্যালয়ের চটুল বিতর্ক সভা। স্বামী ফিলিপ একদিন তাকে বুঝিয়ে-বাজিয়ে-শিখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক-“স্নেহ-ভালবাসা-রমণ খুব ভাল... কিন্তু সফলতা তার চেয়েও ভাল।” আলোচনায় অংশ নিতে উতসাহিত করেন।

দু’জনই কুসীদজীবী মানে বেঙ্কার। কিন্তু মে বেচে নিলেন রক্ষণশীল রাজনীতি। অবশ্য এই বেচে নেয়া নতুন নয়। সেই বারো বছর বয়স থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাবার সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তেন। একদিন বাবা তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন নিজের এলাকায় নিরপেক্ষ থাকতে হলে নিজের দলীয় পরিচিতি জাহির না করা ভাল।

মে ভদ্র কিন্তু খুব মিশুক নন। তার একগাদা বন্ধু নেই। কাজ ছেড়ে উঠেন দেরিতে। সংসদের সুরিখানায় বা বারান্দায় ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস তার নেই। তার সমর্থনকারী অনেকেই ভেবে কুল পান না, এই বন্ধুহীন মহিলা কি করে কেমেরুণের বিকল্প হিসেবে উঠে এলেন?

তেরেশা মে তার অফিসের কাজে খুবই কঠিন, যা ভালভাবে জানেন তাই বলেন আর তার উপর তিনি খুব দৃঢ়ভাবেই সচ্চেষ্ট থাকেন। কেবিনেট সহযোগীদের সাথে খুব কমই পরামর্শ করে কাজ করেন। কেনেথ ক্লার্ক ডাকেন, “কঠিন আনাড়ি মহিলা” বলে। দু’দু’বার হেরে যাবার পর গত ১৯৯৭ সালে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসেন।

ধর্মের দিক থেকে তিনি একজন এঙ্গলিকান কিন্তু পড়েছেন রোমান কেথলিক স্কুলে। ওখান থেকেই তার আদর্শের ভিত্তি গড়ে উঠেছে। তার গড়ে উঠার পটভূমি তাকে এমন একজন হিসেবে গড়ে তুলেছে যে তিনি তার কৃতকর্মের জন্য অন্যকে দোষারূপ করেননা এবং কাজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়াতেই আনন্দ পান।

“রাজনীতি আমাকে কব্জা করে নিয়েছে”, এই গেল ২০১৪ সালেই বলেছিলেন তেরেসা মে। তিনি তখন আরো বলেছিলেন-“কথাটি শুনতে খুব নীরস আর গতানুগতিক মনে হয় ঠিকই,” “কিন্তু আমি একটি পরিবর্তন আনতে চাই। আমিও বিতর্কের অংশীদার হতে চাই।”

মাত্র ৫৯ বছর বয়সে, গেল বুধবার তিনি বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীর আসনের সৌন্দর্য্য বর্ধন করেছেন আসন গ্রহন করে। চালাক মহিলা, দলীয় বয়স্ক অনেককে পেছনে ফেলে সামনে চলে এসেছেন, বৃটেনের দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়ে।

তিনি প্রকাশ্যে কখনই চাননি এ পদ। কেমেরুণ গণভোটে হেরে তার ভাগ্যে রাজটিকা পড়িয়ে দিয়েছেন। বৃটেন এখন গভীরভাবে দ্বিধাবিভক্ত একটি রাষ্ট্র। দুনিয়ায় তার অবস্থান নিয়ত পরিবর্তনশীল। বৃটেনের একতা প্রশ্নের সন্মুখীন। স্কটলেন্ড তাদের স্বাধীনতার প্রশ্নে এখনও পুরাতন রাস্তায় হাঁটছে। বৃটেনের অর্থনীতি অনিরাপদ ঝুঁকির উপর দাড়িয়ে। এই অবস্থায় সময়ই হয়তো তার মত একজন দৃঢ়চেতা, সাহসী স্পষ্টভাষীকেই কালের দিনপঞ্জিকায় তুলে রেখেছে। হয়তো তিনিই বৃটেনের নাজুক সময়ের একমাত্র কর্ণধার। আগামীর দিনগুলিতেই এর সঠিক জবাব লুকিয়ে রয়েছে।

(নিউইয়র্ক টাইমসে স্টিভেন এরলেঙ্গার এর প্রতিবেদন অবলম্বনে অনুদিত।)